‘শেষমেশ সিনেমা কবিতা নয়, সিনেমা সিনেমাই’

সাক্ষাতকারঃ ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

*একটা সাক্ষাতকার নেবার কথা হচ্ছিলো অনেকদিন ধরেই। কখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছবি, কখনো সিনেমা-সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, কখনো কৌরব পত্রিকার সাম্প্রতিক কবিতা ও সিনেমা বিষয়ক সংখ্যার জন্য। কিন্তু কোনো প্রথাগত সাক্ষাতকার না হলেও, **ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের** সাথে একদিন আচমকা ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে যে আড্ডা ২০১০ সালের এক ভিজে সকালে শুরু হয়, তারই জল গড়িয়ে যায় পরের বছর নভেম্বরে, সিনসিন্যাটি শহরে আমাদের বাড়ির বেসমেন্টে। ঠান্ডার কারণে বারবার সিগারেট-ব্রেকের জন্য বাইরে বেরনো যাচ্ছিলো না। আমরা বেসমেন্টের স্নানঘরের বড় এক্সস্ট ফ্যানের নিচে সাহিত্য ও সিনেমার সংক্রামক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। এর দুদিন পর শহরের প্রেয়রি আর্ট-গ্যালারিতে বিদ্বজ্জনের সামনে সিনেমা-কবিতা-সাহিত্য নিয়ে আরো অনেক আলোচনা/পাঠ চলে। এইভাবেই দানা বাঁধছিলো যে প্রায়-ব্যক্তিগত সংলাপ, একদিন মনে হলো তা আসলে খুব ব্যক্তিগত কিছু নয়। বরং সহজেই সমষ্টির হতে পারে এই সমস্ত আলোচনা। গড়ানো জলের সাথে আরো কিছু নদী ও বৃষ্টিধারা মিশলো, আরো একটু সময় ধরে পাওয়া গেল এক মেধাবী অভিনেতা ও চলচ্চিত্রচিন্তকের পলকাটা নিজস্ব স্ফটিক।*

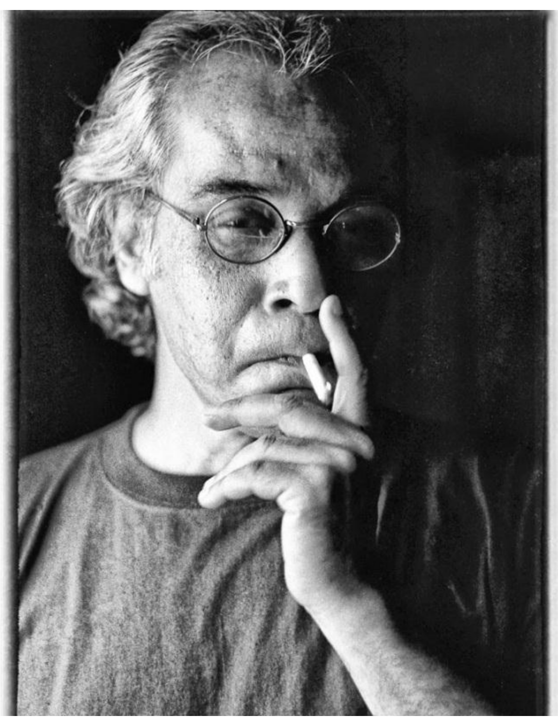

আলোকচিত্রঃ ডমিনিক সানসোনি

আর্যনীলঃ

লুই ব্যুনিউয়েলের একটা উক্তি দিয়ে শুরু করি। ১৯২০র দশকে উনি একবার বলেছিলেন - 'The cinema seems to have been invented to express the life of the subconscious, the roots of which penetrate poetry so deeply'। একই বিষয়ের ওপর ডি ডব্ল্যু গ্রিফিথের মতো কেউ কেউও যা বলেছেন তার থেকে মনে হয়, অন্তত পশ্চিমে, চলচ্চিত্রের ভাষা শুরুতে ছিলো কবিতারই দোসর। এরপর ১৯৬৫ সালে ইতালীর পিসারোতে নিউ ফিল্ম ফেস্টিভালে আমরা দেখতে পাচ্ছি পীয়ের পাসোলিনি বলছেন - 'The inner law of the film, that of "obsessive framing," thus shows clearly the preponderance of a formalism as a myth finally liberated and hence poetic. But then, gradually, the language of poetry, that is cinema made way for the language of the narrative'। চলচ্চিত্র শিল্পের, অন্তত তার ভাষার ক্ষেত্রে, এই রাতারাতি পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?

ধৃতিমানঃ

দেখো, গোড়াতেই বলি, আমি কিন্তু ফিল্ম-থিয়োরিস্ট বা আকাদেমিক নই, অন্তত সেভাবে trained নই। চলচ্চিত্রের ইতিহাস বিষয়েও আমার সীমিত জ্ঞান। আরো কী জানো তো? আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে সেই সমস্ত শিল্পের মধ্যে সমান্তরাল টানা যেগুলোর প্রতি আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে আকর্ষণ আছে। যেমন ধরো সত্যজিত রায় –পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের যে কাঠামো –structure – সেটা ওঁকে নিজের ছবির চরিত্র গড়তে খুব সাহায্য করতো।কবিতা আর সিনেমার মধ্যে মিলগুলো হয়ত তোমরা বেশি করে দেখতে পাও। আমি কবিতা পড়ি,, , বিশেষ কয়েকজন কবি আমার খুব প্রিয়, কিন্তু সেটা আমার পাঠাংশের খুব সামান্য একটা অঞ্চল। কাজেই সিনেমা কবিতা হিসেবে শুরু হয়েছিলো কি না...এ নিয়ে খুব জোর দিয়ে আমি কিন্তু কিছু বলতে পারছি না। প্রশ্নটা মনে থেকে যাবে হয়তো, কিন্তু খুব যে একটা immediate resonance হবে তা মনে হয়না...

আর্যনীলঃ

কিন্তু ধরুন পাসোলিনি যেটা বলছেন, উনি তো নিজে কবিও ছিলেন ... অবশ্য আপনার concern টাও সত্যি, যে ব্যক্তিগত আকর্ষণই এই মিল-দেবার খেলাটায় আমাদের প্ররোচিত করে...

ধৃতিমানঃ

দেখো, সিনেমার ভাষা কবিতা দিয়ে শুরু হয়ে গদ্যের দিকে চলে গেলো – এইরকম একটা ধারণার মধ্যে কিন্তু একটা sweeping generalisation আছে যা আমি মানতে পারতে পারছি না।। আর যে কোনো শিল্পমাধ্যমের মতো সিনেমাও কিন্তু একটা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফসল। ব্যুনিউয়েলের আত্মজীবনীতে দেখি নিজের ছবি নিয়ে যতোটা উল্লেখ/আলোচনা তার চেয়ে অনেক বেশি কথা নিজের চারপাশের অনন্য সব মানুষকে নিয়ে, তাঁর রাজনৈতিক পারিপার্শ্ব, শিল্প আন্দোলন সম্বন্ধে নানা আলোকপাত, যার থেকে আমরা বুঝতে পারি কী ধরনের প্ররোচনা থেকে উনি ওইসব ছবি করেছেন।

এখন ওঁর সেইসব ছবি, আর একই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় ভার্তভ, দন্সকয়, কোজিন্তসেভ যেসব ছবি করছেন, - তা কি এক? বা USA- তে যে সব দারুণ ছবি হচ্ছিল? সেগুলো মূলত পদ্য না গদ্য?

আর্যনীলঃ

আচ্ছা, বেশ... লুই ব্যুনিউয়েলের যে উক্তি দিয়ে শুরু করলাম সেটা ১৯২০র। এখন আমরা যখন চলচ্চিত্র-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করি, অনবরত এবং প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো পশ্চিমী ঝোঁক, আন্দোলন প্রভৃতির প্রসঙ্গ টানি, তাই না? কিন্তু এই একই সময়ে তো আমাদের দেশেও চলচ্চিত্র উৎপাদন শুরু হয়েছে। তো, এই সমস্ত, প্রথমদিকের ছবি কী ধরনের চিত্রভাষাকে অবলম্বন করেছিলো ও কেন?

ধৃতিমানঃ

এই যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষ নিয়ে এই যে গোটা ব্যাপারটা, এই যে ইউফোরিয়া, এর মধ্যে কিন্তু বিরাট সমস্যা আছে। প্রথমত, যদি শতবর্ষ উৎযাপন করতেই হয় তবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারের চলচ্চিত্রকে এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। দ্বিতীয়ত, এই প্রশ্ন সম্প্রতি উঠেছে যে ভারতীয় ছবিকে উত্তর-ঔপনিবেশিক কাল থেকে ধরা উচিত কি না।

যাই হোক, এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয়, কাজেই ছেড়ে দাও, কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম থেকেই এক ধরনের লব্জ বা idiom তৈরি হতে থাকে যার থেকে ক্রমে কিছু প্রবণতা নির্ণীত হয়। একদিকে আমাদের যেসব সাবেকি নাট্যধারা ছিলো – গীতি, নৃত্যনাট্য তারপর ভক্তিমূলক নাটক ইত্যাদি...এইসব জনপ্রিয় উপাদানগুলোকে কাজে লাগিয়ে এক ধরনের লোকপ্রিয় এক শিল্প গড়ে তোলার একটা প্রয়াস শুরু হয়। আবার অন্যদিকে দেখবে বিশ দশকের শেষের দিকে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যোগ্য একধরনের পরিশীলিত, নাগরিক ছবি তৈরি হচ্ছে বিশেষ করে সেই অডিয়েন্সের জন্য যাঁরা ততোদিনে হলিউডি ছবির সাথে পরিচিত। সেইসময় কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্পে যাঁরা আসছেন তাঁদের অনেকেই বিদেশে, ইউরোপে, হলিউডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

আর্যনীলঃ

এর বাইরে কি...

ধৃতিমানঃ

হ্যাঁ, সেটাই বলছি। এর বাইরে একটা তৃতীয় ব্যাপারকে চিহ্নিত করাও দরকার যা ভারতীয় ছবির ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করবে। শিল্পমাণ বা প্রবণতার কথা থাক, একটা industry কিন্তু গড়ে উঠছিলো সেসময়...দক্ষিণ ভারতে আর কলকাতায়। আর একদল নতুন ব্যবসায়ীদের হাতে। আর সেই ইন্ডাস্ট্রির রূপরেখাই কিন্তু সেই সময়কার চলচ্চিত্রকে প্রভাবান্বিত করছিলো। তাকে আকৃতি দিচ্ছিলো। ১৯৩১ সালে সরকার সাহেব মার্কিনী ধাঁচে নিউ থিয়েটার্স পত্তন করেছিলেন। ২৪ বছরে নিউ থিয়েটার্স ৫৫টা ছবি করেছিল। ভাবতে পারো?

বাংলা film industry-কে তৈরী করেছিল, বাঙালিয়ানা বলতে কী বোঝাবে, প্রায় পাঁচ দশকের জন্যে, তার সংজ্ঞা বেঁধে দিয়েছিল।

কাজেই, মোদ্দা কথা, আমি যেটা বলতে চাইছি, সেটা হলো সিনেমা কিন্তু কোনো autonomous শিল্প নয়। It has never been independent of the industry that sustains it.

আলোকচিত্রঃ পাবলো চট্টোপাধ্যায়

আর্যনীলঃ

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ফিল্ম ও কবিতার মধ্যে সত্যিই কোনো সম্পর্ক আছে নাকি ওটা এক ধরনের রোম্যান্টিক স্বপ্নচারিতা? এক কাল্পনিক মিশেল?

ধৃতিমানঃ

আচ্ছা, আমি না, এই দ্যাখো...আমার শেলফ থেকে একটা কবিতা বই... এই বের করলাম। এবার, দ্যাখো, at random পাতা ওল্টাচ্ছি আর এই লাইন দুটো পেয়ে গেলাম। শোনো –

যতক্ষণ তুমি কৃষকের পাশে আছো,যতক্ষণ তুমি
শ্রমিকের পাশে আছো আমি আছি তোমার পাশেই।

চিনতে পারছো তো? ...

আর্যনীলঃ

শামসুর রহমান?

ধৃতিমানঃ

না, নির্মলেন্দু গুণ। কি সহজ রচনা! একদম জলের মতো কথা। তাইতো? কিন্তু কেন একে কবিতা বলা হবে? কেনই বা গদ্য নয়? কারণ শব্দ নির্বাচন, তার সযত্ন চয়ন, তার সুনিপুণ পুনর্ব্যবহার বা refrain, একটা লয় যা গদ্যে পাওয়া যাবে না। তাই এই দু-লাইন কবিতা। এই যে ছন্দোলয়, এই cadence, ভালো ছবিতে কিন্তু এইটা থাকে। কাজেই কবিতা এবং সিনেমার মধ্যে সম্পর্ক অতি-অবশ্যই রয়েছে। বা ধরো, শক্তিদার কবিতা…এই যে…… **'এ-সুখ শতায়ু হবে'**… এ কী টেরিফিক সিনেমা নয়? তুমি কবিতাটাকে একেবারে যেভাবে লেখা হয়েছে ঠিক সেইভাবে নিতে পারো, আর তার থেকে এক সাঙ্ঘাতিক প্রথম দৃশ্যের চিত্রনাট্য হ'তে পারে… এই যে… শোনো…

ডান ও বাঁহাতি দিই সুপারির একহারা গরাদ,
যেন মনে হয় আমি মুক্ত জেলখানায় রয়েছি।

আর্যনীলঃ

"সে বড়ো সুখের সময় নয়…"-এর একটা জায়গা মনে পড়ে যায় যেখানে শক্তি লিখছেন পুলিশের গাড়ি প্রসঙ্গে- স্মৃতি থেকে বলছি… "ছুঁড়ে ফেলে দেয় কালো গাড়ির বাইরে/ কিন্তু অন্য এক কালো গাড়ির ভেতর/যেখানে সবসময় কেউ অপেক্ষা করে আছে/ মাকড়শার সোনালি ফাঁস হাতে/ মালা, তোমায় পরিয়ে দেবে / তোমার বিবাহ মধ্যরাত্রে…" … মৃত্যুর সাথে মাঝরাতে দেখা এমন এক মুক্ত জীবন যা কিন্তু সেই জেলখানাই…

ধৃতিমানঃ

হ্যাঁ, দ্যাখো, কত সযত্নে শব্দচয়ন করা হচ্ছে, যেন কী কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের নিচ থেকে মুক্তো তুলে আনা হলো। এটাই কবিরা করে। তারা শব্দের যাদু-ব্যবহারটা জানে। আর এই একই কাজ কিন্তু চলচ্চিত্রকারও করে, ইমেজ দিয়ে। ইমেজের সযত্নচয়ন। এবং এডিটিং। কাজেই কেন 'রোম্যান্টিক স্বপ্নচারিতা' হবে? আমার যেটা মেনে নিতে অসুবিধে হয় - এইসব ধারণা - যে এক শিল্পকে অন্যটার মতো করে হয়তো কোনোদিন ভাবা হতো বা হয়েছিলো। চলচ্চিত্রকার একদিন বললেন, 'চলো, এবার আমরা ক্যামেরা দিয়ে কবিতা লিখি' – এসব মেনে নিতে আমার খুব অসুবিধে…

আর্যনীলঃ

… আপনি সেদিন বলছিলেন না? যে ভালো ছবিকে অনেক সময়, আজো, 'আহা! কবিতার মতো' বলে একটা মহার্ঘ্য তুলনা দেবার চেষ্টা করা হয়…

ধৃতিমানঃ

Exactly, একটু প্রসঙ্গ পালটে সেখানেই যাই। ফিল্ম এবং সাহিত্যপত্রিকায় এইরকম একটা বর্ণনা দেওয়া হয় অনেক সময়। ভালো ছবিকে। এক ধরনের...এক অভিজাত আঁতেল দ্যোতনা, যাকে বলে elitist connotation... সেইরকম একটা আবহ তৈরি করা হয়। এগুলোতে আমার প্রবল অস্বস্তি। যেন আমরা এক অভিজাত শিল্প-সম্প্রদায়ের কেষ্ট-বিষ্টু – এমন এক সম্প্রদায় যেখানে কোনো সাধারণ সদস্যপদ নেই। কিন্তু সদস্য হবার নিয়মাবলী যে কী তা আমরা নিজেরাই, আঁতেলরা, জানিনা।

ভালো ছবি, যে কোনো উৎকৃষ্ট শিল্পই, মানুষের সক্রিয় যোগদান চায়। দর্শক বা পাঠকের অংশগ্রহণ, তাঁদের নিজস্ব ব্যাখ্যা, প্রতিক্রিয়া – এগুলো জরুরী। একধরনের অসাড় বিনোদন কিন্তু উৎকৃষ্ট শিল্পের জন্ম দিতে পারেনা। এবং লেখক-কবি বলো, শিল্পী বলো, চলচ্চিত্রকার বলো – এঁদের অন্তরীন, আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা আর চারপাশের বাস্তবতার একটা মেলবন্ধন থেকেই কিন্তু এই 'ভালো শিল্প'টা তৈরি হয়।

এখন এর মানে অবশ্যই এই নয় যে বিনোদনকে সিরিয়াসলি নেবার দরকার নেইবা,সিনেমাতেই হোক, কবিতাতেই হোক, সব রকমের দুরুহতাকেই সিরিয়াসলি নিতে হবে। । বুদ্ধিমান দর্শক/পাঠকমাত্রই কিন্তু বুঝতে পারেন যে সুধীন দত্ত আর তারকোভস্কির obscurity তার বুদ্ধিমত্তা, তার emotion, তার ভাষাবোধকে চ্যালেঞ্জ করছে আর অমুকের obscurity স্রেফ মধ্যমেধার, mediocrity- র ঢাকনা।

আচ্ছা, এবার শক্তিদার ওই কবিতায় ফিরে যাই আবার?

আর্যনীলঃ

নিশ্চয়।

ধৃতিমানঃ

আমি বলতে চাইছিলাম যে একটা কবিতার ভিত্তিতে অবশ্যই ছবি হতে পারে। কবিতা অবশ্যই সিনেমা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এর মানে কি চলচ্চিত্র আসলে কবিতা? ফিল্ম, শেষমেশ কিন্তু ফিল্মই। যা তার নিজের শিল্পের নিজস্ব শর্তে নির্মিত। এই ফিল্মটা একটা কবিতা। বাক্যটির অর্থ কী? ভেবে দেখো। আমার কাছে অর্থহীন। অপর্ণা সেনের "Japanese Wife" বেরনোর পর অনেকে (মূলত নিয়মিত দর্শক, সমালোচক নন) বলতে শুরু করলেন যে ছবিটা 'কবিতার মতো'। এইরকম শুনলে না আমার সত্যি গা-জ্বালা করে... (হাসি...) ... সত্যিই... this I found irritating.

আর্যনীলঃ

(হাসি...) হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে বোধহয় আপনার একটা ট্যুইট দেখেছিলাম...

ধৃতিমানঃ

রীনা (অপর্ণা সেন) এগুলোকে আমল দেয়নি এই কারণে নয় যে এনারা ওর ছবির প্রশংসা করছেন; ও বুঝতে পেরেছিলো এদের যেহেতু কোনো alternative film vocabulary নেই, এই ধরনের ছবিকে প্রশংসা করার সঠিক অভিব্যক্তিও নেই।

শক্তিদার কবিতায় ফিরে যাই। ওঁর কবিতা দিয়ে ছবির একটা দৃশ্যের কাব্যিকতা শুরু করে কিন্তু পরিচালক পরের সীনেই বা মুহূর্তেই খুব কেজো গদ্যধর্মি একটা সিকোয়েন্সে চলে যেতে পারেন। মানে মোদ্দা কথা হলো সিনেমা ও কবিতার একে অন্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে ঠিক, কিন্তু একজন চলচ্চিত্রকার – যদি নিজের কাজের প্রতি, শিল্পের প্রতি সৎ হন, সেইখানেই তিনি যাবেন যেখানে তাঁর আগ্রহ তাঁকে টানছে এবং কখনোই 'আমি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কবিতা লিখবো' – এমন ভাববেন না। কেননা শেষমেশ সিনেমা কবিতা নয়, সিনেমা সিনেমাই।

যে কোন শিল্পের সঙ্গেই অন্য শিল্পের কিছু মিল আছে, কিছু তফাৎ আছে, এটা তো প্রায় স্বতঃস্বিদ্ধ। সিনেমার সঙ্গে কবিতার প্রাণের যোগ হয়ত বা কিছুটা গাঢ়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হল হঠাতই, অপ্রাসঙ্গিক নয় একেবারেই, একটা বড় ফারাক কোথায়। বরাত ভাল থাকলে ভাল সিনেমা করেও বড়লোক হওয়া যায়। ভাল কবিতা লিখে, আমি যদ্দূর জানি, সংসার চালানো যায় না। সেই কারণেই কবিরা special ।

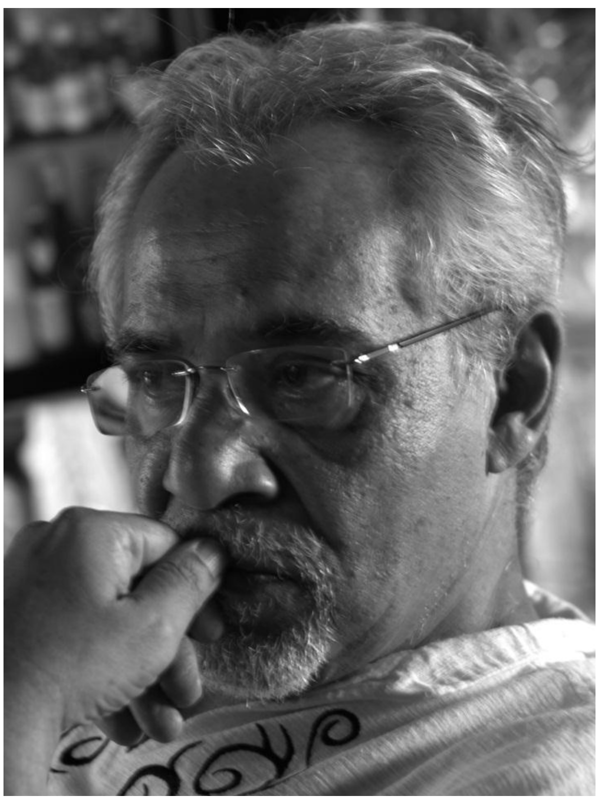

আলোকচিত্রঃ পাবলো চট্টোপাধ্যায়

আর্যনীলঃ

শিল্পের ভাষার কথায় বলি কবিতা লেখা হয় কাগজে বা সাম্প্রতিককালে পর্দায়, শব্দের, বাক্যের সাহায্যে। সাধারণত একজন ব্যাক্তির দ্বারা। কিন্তু ফিল্মের ভাষা আসছে হাজারটা অনুষঙ্গ, সূত্র থেকে – শব্দ, ভাষা, লিপি, কণ্ঠস্বর, ধ্বনি, সঙ্গীত, আলো, নীরবতা, টেক্সচার প্রভৃতি। আদুর গোপালকৃষ্ণন সম্প্রতি বলেছেন সিনেমার ভাষা 'নিশ্চয় এক অর্থে কবিতার মতো, কিন্তু তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী'। এ প্রসঙ্গে আপনার কী মনে হয়?

ধৃতিমানঃ

এটা নিয়ে কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ভাবি – যে চলচ্চিত্র সত্যিই এক অখন্ড, সুসংহত শিল্পমাধ্যম কিনা। মানে, এ শিল্পে সত্যি কি একাধিক উপাদান একধারায় মিশে যায়? নাকি এটা একটা reductionist medium । এমন কিছু, এমন কোনো ভাষা কি এই শিল্পে আছে যা অন্য শিল্পের কাছে নেই? ধরা যাক – সময়। মনে আছে তারকভস্কির কথা? - 'Sculpting in Time'। বহু মানুষ – দর্শক, চলচ্চিত্রকার, ফিল্ম-তাত্ত্বিক এটা নিয়ে ভেবেছেন – যে সত্যিই ফিল্ম সময়ের এক ভাস্কর্য কিনা।

অনেক ভেবেচিন্তে আমার তো মনে হয় জানো, যে ফিল্মের essence বলে যদি কিছু থাকে, তা হল সময়কে নিয়ে খেলা করার এই ক্ষমতা। লীলাখেলাও বলতে পারো। আমার দেখা আর অভিনীত ছবি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু তার জন্যে তো আরেকটা সাক্ষাৎকার লাগবে। সত্যজিৎ রায়, অরসন্ ওয়েল্স, আমোস্ গিতাই, নুরি সেইলান...। কখনো একটা শট ধরা থাকছে তো ধরাই থাকছে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছি। আবার কখনো আমাদের সময়ের সমস্ত হিসেব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

আবার শোনোঃ

প্রবাসে, দৈবের বশে
আমাদের দূরের ঘরের মেয়েরা
দূরে যেতে যেতে
স্টেশন থেকে
বাগানে চিঠি দিও।

(স্বদেশ সেন)

কবিতাটি বিচরণ করছিলো বর্তমানে একেবারে শেষের দিকে এসে কেমন অনায়াসে সময়ের বেড়া টপকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে চলে গেল। কবিতা ছুঁয়ে গেল সিনেমাকে। তবে কোন চলচ্চিত্রকার এসব দর্শন নিয়ে অবসেসড হয়ে পড়েন কিনা জানিনা। তাঁরা ছবি বানাতে ভালোবাসেন, বানান। কাজের আগে থিওরিকে আমি বসাতে চাইনা।

আর্যনীলঃ

না, আমি কিন্তু শিল্পনির্মানের আগে তত্ত্বকে বসাতে চাইছিনা। বরং অনেক শিল্প নির্মিত হবার পর তার মধ্যে কোনো বিশেষ প্রবণতার ধারা রয়েছে কিনা বুঝতে চাইছি। খানিকটা শনাক্তিকরণের সাহায্যার্থে...

ধৃতিমানঃ

শনাক্তিকরণের প্রশ্ন এলে তখন প্রথমেই কিন্তু যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো কবিতা, নভেল, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য – এগুলোর তুলনায় ফিল্ম কিন্তু যৌথশিল্প। বহু লোকের স্কিল দিয়ে এটা তৈরি হয়। এবং পরিচালক, বা প্রযোজক বা কখনো যিনি টাকা দিচ্ছেন, তাঁর বা তাঁদের ভিসন অনুযায়ী এই স্কিল-সমূহকে ব্যবহার করা হয়। Look at it from the performers' point of view– নৃত্যশিল্পী বা মঞ্চাভিনেতার শিল্পজীবনে 'দ্বিতীয় টেক' বলে কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু সিনেমায় আছে। The performer is given a second chance by people who collaborate with her.

কাজেই সিনেমার ভাষা কবিতার চেয়ে প্রোন্নত কিনা আমি ঠিক জানিনা। অনেক দামী – খরচসাপেক্ষ নিঃসন্দেহে। আর exhausting। আর অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাজে অনেক সহজে পৌঁছয়।

কিন্তু উচ্চাঙ্গের কবিতা লেখা 'চলতা হ্যায়' সিনেমা নির্মাণের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। আর ওই যে বললাম, পদ্য লিখে বাজার খরচ ওঠে না।

আর্যনীলঃ

১৯৬০ সালের সেই বক্তৃতায় (যেটা পরে কাহিয়ে দ্যু সিনেমায় প্রকাশ পায়) পাসোলিনি আরো একটা কথা বলেন। ওঁর মতে নিওরিয়ালিস্মের সময় থেকে ক্যামেরার চোখের চরিত্র বদলাচ্ছিলো। এর আগে ক্যামেরা ছিলো এক নৈর্ব্যক্তিক কথক – স্রেফ গল্পটা বলে দেওয়া যার কাজ। নিজের উপস্থিতি না জানানো। কিন্তু নিওরিয়ালিস্টরা ক্যামেরাকেও এক অভিনেতার চরিত্রে নামায় – এক অদৃশ্য, অশ্রুত চরিত্র যে গল্প বলার সাথে সাথে নিজের কথাও বলে তার দেখার চোখের মাধ্যমে। এবং ওঁর মতে এই চরিত্রই সিনেমাকে আবার কবিতার প্রাঙ্গনে ফেরাচ্ছিলো। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন?

ধৃতিমানঃ

এটা একটু ব্যাখ্যা করতে হবে।

আর্যনীলঃ

যেমন ধরুন উনি বলছেন যে ৩০-এর দশকে Keaton, Chaplin, Marx Brothers – প্রমুখের ছবিতে ক্যামেরা অনড়। এবং এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে গল্পটা বলে। তার গোটা কথকতাটাই স্থির, অনড় এবং কিছুটা তৃতীয় পুরুষের মতো। নিওরিয়ালিস্টরা এর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং প্রথম ক্যামেরাকে তার নিজস্ব চরিত্র দেন। একটা দৃশ্যিক উদাহরণ দিচ্ছেন উনি খুব সম্ভব কোনো নিওরিয়ালিস্ট ছবি থেকে - রাস্তার এক জায়গায় একটা গাড়িকে ঘিরে ভিড়। ওখানে কিছু একটা হয়েছে। সকলের দৃষ্টি, আকর্ষণ সেদিকে। ক্যামেরাও ওদিকে যাবার চেষ্টা করে প্রথমে। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে, দর্শকের কৌতূহল না মিটিয়ে আচমকা রাস্তায় পড়ে থাকা একটা রুমাল দেখায় বা টিল্ট করে তিনতলার বারান্দায় এক সুন্দরীকে দেখায়, ভিড় দেখছে - এই রুমাল

বা সুন্দরীর সাথে কিন্তু রাস্তার জটলার বা কাহিনির কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ক্যামেরার যেন একটা 'নিজের মন' আছে। এবং এই 'মন'টা কবির, কাহিনিকার বা কথকের নয়। এটাই পাসোলিনির মূল বক্তব্য।

ধৃতিমানঃ

এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে চলচ্চিত্রকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সিনেমার ইতিহাসের কোনো একটা সময়ে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কিন্তু এটা কবিমনের স্বঘোষণা, কাহিনিকারের মনের পরিচায়ক নয় – এইভাবে বলাটা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়? এমনভাবে বললে কি হয়? – যে এখানে চলচ্চিত্র পরিচালকের নিজের মনের প্রকাশ ঘটছে। আমি একটা কথা বলবো এখানে - সিনেমাকে তার নিজস্ব স্বাধীন এক পরিমন্ডল দেওয়া হোক। Grant cinema its independent space। মনে করো, যদি কেউ তোমার কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে তার কতোটা নাট্যগুণ, কত ফিল্মিক, বা সাংগীতিক, কতোটা চিত্ররূপময় – এসব দেখাতে থাকে তোমার কেমন লাগবে?

আলোকচিত্রঃ গনেশ বাবু

আর্যনীলঃ

হ্যাঁ, এটা আপনি একটু আগেই বললেন... ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যেহেতু সাহিত্য সিনেমার চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং এটা অনস্বীকার্য যে বানিজ্য হিসেবে যে সিনেমার ধারা শুরু হয় সেটা ছিলো মোটামুটি সাহিত্য-নির্ভর, তাই হয়তো এইরকম একটা তুলনা আসতো, বা এখনো আসে। তাছাড়া, পাসোলিনি এইসব বলছেন ১৯৬০ সালে – ৫৩ বছর আগে...

ধৃতিমানঃ

বেশ, এবার এই ব্যাপারটাকে একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক, কেমন! আমার সবসময়েই মনে হয় যে অভিব্যক্তি, যে কোনো শৈল্পিক অভিব্যক্তিকে প্রযুক্তি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। তাই নয় কি? অক্ষরের কথাই ধরা যাক। যখন প্রস্তরে লেখা হতো, সমস্ত ভাষার হরফ ছিলো ট্যারাব্যাঁকা। আস্তে আস্তে কলম এলো – তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা বিশেষ। নতুন প্রযুক্তি আরো নরম মাধ্যমের ওপর লেখার সুযোগ করে দিলো – যেমন গাছের পাতা, কাপড় ইত্যাদি। এই সময় ক্যালিগ্রাফি কিন্তু বদলে গেলো। হরফ আস্তে আস্তে গোলাকার হতে শুরু করলো। গুহামন্দিরের বদলে এক সময়ে প্রস্তরের মন্দির তৈরি হতে শুরু করে – যখন মানুষ নিখুঁত আকারে পাথর কাটতে শেখে। শিল্পের প্রগতির পেছনে শিল্পপ্রযুক্তির একটা বিরাট ভূমিকা আছে। বারবারই...

আর্যনীলঃ

নিঃসন্দেহে... যেভাবে কম্প্যুটর গ্রাফিক আর্ট উঠে এলো, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি সফটওয়ার...

ধৃতিমানঃ

তারো অনেক আগে, তেলরঙের বদলে অ্যাক্রিলিক। এমনকি বীরভূমের একেবারে প্রত্যন্তে আয়োজিত যে বাউল মেলা সেখানেও এখন অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহৃত হচ্ছে। গত বছর শীতে লোহাগড়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম লোকশিল্পীরাও স্পীকার ব্যালান্স করে নিয়ে তবে গান শুরু করছে। সেই রকম সিনেমাতেও এখন এমন অনেক সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা দেখতে পাচ্ছি যা সম্পূর্ণভাবে নতুন প্রযুক্তির অবদান... new technology is allowing them to happen. Faster film allowed the crew to move out of a cage which had to be bathed in light। কাজেই অনেক সময়েই ওই যে চ্যাপলিন, কীটন, মার্ক্স-ব্রাদার্সের কথা বললে না ? ওদের ছবির ক্যামেরার নড়াচড়া কম ছিলো কেননা ক্যামেরাটা সে যুগে অত্যন্ত ভারী ছিলো। এবং তা সত্ত্বেও ওঁরা কিন্তু নিজেদের ছবিতে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কাজেই পাসোলিনির কথাটা আমার কিছুটা হাস্যকর লেগেছে। এই যে - ওদের ছবির ভাষা এই কারণে নৈর্ব্যক্তিক। সে সময়ে অসংখ্য কমেডি ছবি হতো – স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। সেসব ছবির ভিড়ে কিন্তু চ্যাপলিনদের ওই বিরল ছবিগুলো হারিয়ে যায়নি।

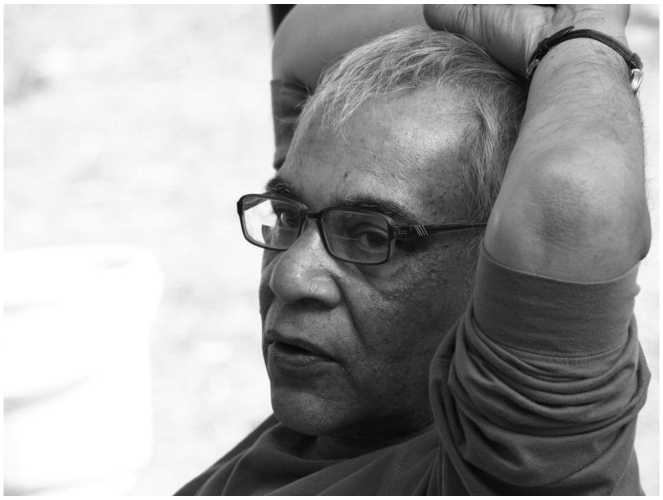

আলোকচিত্রঃ পাবলো চট্টোপাধ্যায়

আর্যনীলঃ

সেটা মানছি। কিন্তু এর উল্টোও তো আছে? যেমন ধরুন যে ছবিটার কথা দুদিন আগে আলোচনা হচ্ছিলো – নুরি সেইলানের 'উজাক' বা Distant। ব্রিটিশ টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে সেইলান বলছেন ক্যামেরা কে স্থির করে রেখে, কোনো কৃত্রিম আলোর ব্যবহার না করে ছবিটা তুলেছেন। এবং ওজুর একটা প্রভাব আছে ওঁর ওপর। প্রযুক্তির ন্যূনতম ব্যবহার। এবং এ প্রসঙ্গে সেইলান দুটো জিনিস বললেন যা আমাকে অবাক করেছে – ১) ওজুর ছবির প্রসঙ্গে বললেন – 'ওঁর ছবিতে একটা কবিতা-প্রবণতা আছে সেইটা আমার খুব ভালোলাগে, সেইটা চেয়েছিলাম', আর ২) 'আমি নিজে খুব টেকনিকাল লোক, ওইসব যন্ত্রপাতি ভালোবাসি, পেশায় ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু এই ছবির ভাষার জন্য আমার প্রযুক্তির প্রয়োজন ছিলো না'। সেইলান এটাও বললেন যে আন্তন শেখভের লেখার একটা প্রভাব ওর ছবিতে প্রায়ই আসে। নিজের জীবন, আলোকচিত্রকলা, বন্ধুরা, ইস্তানবুল, সাহিত্য (বিশেষত রুশ সাহিত্য) এবং ওজুর ছবির 'কবিতা' – এই সমস্ত কিছু নিয়েই নিজের ছবি। কাজেই সিনেমার ভাষাকে খুব নিজস্ব কিভাবে বলা যায়? সেটা অসংখ্য জিনিসের মিশ্রণের ফলে আসছে না? সব শিল্পের ক্ষেত্রেই তাই। বিশেষত এই ছোট হয়ে আসে পৃথিবীর যুগে। কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে সেটা হয়তো আরো বড় সত্যি – কেননা এই যৌথশিল্পে হাজারটা জিনিস, মানুষ ও সমাজ-প্রবণতা যুক্ত। আপনার কি মনে হয়?

ধৃতিমানঃ

তবে "নিওরিয়ালিস্টরা প্রথম ক্যামেরাকে তার নিজস্ব চরিত্র দেন" – এটাতো একেবারেই মানা যায় না। Come on! Wake up। ভুলে যেও না আইজেনস্টাইন নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। যিনি নিওরিয়ালিস্টদের অনেক আগে ছবি করেন। Odessa Steps মনে আছে?

আর্যনীলঃ

ইন ফ্যাক্ট ওই বক্তৃতায় পাসোলিনি বেশ কয়েকবার আইজেন্‌স্টাইনের কথা এনেছিলেন, তবে অন্য প্রসঙ্গে...

ধৃতিমানঃ

...১৯৪০-এর দশকে কিন্তু ক্যামেরা অনেক হাল্কা হয়ে এসেছে। কোডাক ১৬ মিমি ক্যামেরা বের করে ফেলেছে। ক্যামেরা হাতে নিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। কাজেই পরিচালকেরা এমন অনেক কিছু সেযুগে করতে শুরু করেন যেটা নতুন প্রযুক্তি তাকে করতে দিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে গাড়ির কথাটা পাসোলিনি উদাহরণ স্বরূপ পাড়লেন এই ব্যাপারটা কি সমানুপাতিক দেখো – **প্রতিদ্বন্দ্বী**র সেই দৃশ্যটা মনে পড়ছে?

আর্যনীলঃ

কোনটা?

ধৃতিমানঃ

সেই যে সিদ্ধার্থ বোনের বসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, প্রচন্ড ক্রুদ্ধ, বেরিয়ে এসে দেখছে রাস্তায় একটা জটলা। একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। জনতা ড্রাইভারকে বেদম পেটাচ্ছে। দৃশ্যটার জন্য মানিকদা একটা গাড়ি যোগাড় করলেন, এক ড্রাইভার, আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে (এই মেয়েটি আবার, জানোতো, কয়েক বছরের মধ্যেই মৃণালদার (সেন) পুত্রবধূ হয়)। কিন্তু এগুলো ছাড়া ওই দৃশ্যের বাকি সবটুকুই কিন্তু একেবারে অপরিকল্পিত। এবং মানিকদা সেসব তোলার জন্য প্রস্তুত... আর কী নিয়ে বলোতো?...an Arriflex handheld camera, a triumph of technology!

এর মধ্যে সিদ্ধার্থবেশী আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি ওই ভিড় ভেঙে ঢুকে বেচারা ড্রাইভারকে কয়েক ঘা দিতে। আর ড্রাইভারের ভূমিকায় ওই সত্যিকারের গাড়িচালক বেচারা হয়তো তখন ভাবছে - কি মরতে এই রোলে নেমেছিলাম। যাইহোক, ভিড়ের লোকেরা ড্রাইভারকে ধোলাই দিতে এতই ব্যস্ত ছিলো যে আমি আর বিশেষ সুবিধে করতে পারিনি। They were forming an impenetrable barrier between me and my target। কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি পিছিয়ে আসবো। এবং মানিকদাও সেইমতো ওঁর অরি নিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন। পিছিয়ে আসতে লাগলেন। এবং অবশ্যই ওই দৃশ্যে আমার ব্যবহারের জন্য প্রচুর তারিফ পেলাম, কেননা সেটা সিদ্ধার্থের চরিত্রের সাথে খুব মানিয়ে যায়।

সেই রকমভাবেই পাসোলিনি যে দৃশ্যটার উদাহরণ দিচ্ছেন, সেখানেও ক্যামেরাম্যান হয়তো এইরকমই কোনো কারণে রুমালটা বা ওই মহিলাকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। দ্যাখো, সমালোচকদেরো তো করে খেতে হবে!

প্রতিদ্বন্দ্বী - শেষ দৃশ্য।

আর্যনীলঃ

বেশ, এবার আসি আপনার অভিনীত একটা ছবিতে -36 Chowringhee Lane– যা অনেকের মতে (আমি তো বটেই) 'কাব্যভাষার ছবি' এবং হয়তো অপর্ণা সেনের সেরা ছবি ...

ধৃতিমানঃ

'Poetic cinema'...হম্‌ম্‌। ... আমার তো কখনো মনে হয়নি । তুমি হয়তো বলতে পারবে কেন এমন ভাবো। রীনার সাথে যখন ছবিটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখনো এরকম কোনো কথা ওঠেনি। আর ও কিন্তু কবিতাপ্রেমী, আমি জানি। আমি একটাই কথা বলতে পারি – ছবিটার মধ্যে একটা অদ্ভুত সুন্দর লয়, একটা লালিত্য আছে যেটা আজও মুগ্ধ করে। যেসব ছবি আমাদের ভালো লাগে, সেগুলোর সারাংশ এক কথায় বুঝিয়ে বলা অনেক সময় খুব কঠিন। আমার আর এক পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালী একে বলেন – 'সুর'। অর্থাৎ এক ধরনের সাঙ্গিতীকতা – লিরিসিজম। যদিও আমি ওঁর ছবির খুব একটা ভক্ত এ কথা বলতে পারি না, তবে ওনার ক্ষমতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল।

অভিনয় বা অভিনেতার পারফর্মেন্স সম্বন্ধেও ওই এক কথা – একটা স্বর আছে, সেটাকে ছুঁয়ে ফেলতে হবে। না হলে হলো না। আমার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়েই সেটা খানিকটা intuitively হয়, বা meditatively বলতে পারো। প্রচুর গবেষণা, মহড়া, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করে আমার বিশেষ উপকার হয়না। যে স্বরটা, যে সুরটা আমাকে ছুঁতে হবে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হয়ে নিতে চাই। সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততোক্ষণ কিন্তু নিজের থেকে নিজের নিস্তার নেই। মুশকিল হলো, ওই অতৃপ্তি থেকে নিস্তার পাবার সুযোগ কিন্তু সবসময় পাওয়া যায় না, নানা অচেনা রাস্তা ঘুরে ঠিক রাস্তাটা খুঁজে পাবার মতো সময় পাওয়া... অনেক সময়েই খুব কঠিন।

আর্যনীলঃ

36 Chowringhee Lane–এ আপনার অভিনয়, অভিজ্ঞতার ব্যাপারে কিছু বলুন...

ধৃতিমানঃ

অভিজ্ঞতা? চৌরঙ্গি লেনে...আসলে অনেক কিছুই হয় যা কিন্তু একেবারে প্রথমবার। যেমন অনেকদিন পর একটা ইংরেজি ভাষার ছবি। রীনার প্রথম ছবি। শশীর প্রথম ছবি প্রযোজক হিসেবে। তারপর অশোক মেহতার প্রথম আর্টহাউস ছবি ডি-ও-পি হিসেবে। আমার নিজের জন্য ঐ 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'পদাতিক' এর ইমেজটা ঝেড়ে ফেলা জরুরী ছিলো, এবং 'সমরেশ মৈত্র' এতো অপ্রীতিকর অথচ আকর্ষণীয় এক যুবক - এই পরিবর্তনটা জরুরী ছিলো। ঐ ছবিতে অভিনয়ের জন্য সবচেয়ে বড়ো প্রশংসাটা এসেছিলো বান্দ্রার এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবতীর কাছ থেকে। সে বলেছিলো, 'ওফ! তুমি কী খারাপ একটা লোক হতে পারো!'। সেই 'কী খারাপ'-টা শুনতে যে কী ভালোলেগেছিলো! (হাসি...)

আলোকচিত্রঃ পাবলো চট্টোপাধ্যায়

আর্যনীলঃ

আমি বন্ধুদের সাথে ছবিটা দেখি নিউ এম্পায়ারে, তখন আমার বয়স ১৫। ছবির শেষে নিউ বাদশা রেস্ট্যুরেন্টের দোতলায় বসে কফি খাচ্ছি বন্ধুদের সাথে...আর বলছি, কী করে একজন লেখক এইরকম ইন্সেন্সিটিভ, স্বার্থপর হতে পারে? আর আমার বন্ধুরা আমায় বোঝাচ্ছিলো যে – সমরেশ মৈত্র তো আসলে লেখক নয়। এখন ভাবলে হাসি পায়। লেখক সম্বন্ধে ঐরকম একটা ঐশী ধারণা ছিলো তখন... (হাসি...)

ধৃতিমানঃ

(হাসি...) না, আর বান্দ্রা সম্বন্ধে তুমি কতোটা জানো জানিনা... the Anglo Indian ladies from Bandra had an enviable reputation in those days...কাজেই, বুঝতে পারছো এর চেয়ে বড়ো তারিফ আর কী হতে পারে।

এছাড়া দেবশ্রীর বিপরীতে অভিনয় করার ব্যাপারে আমার একটা বিরাট কিন্তু-কিন্তু ছিলো। ও আমার চেয়ে অনেক ছোট, তার সঙ্গে অতোগুল চুম্বনদৃশ্য করা... তবে এত বছর পরে একথা নিশ্চয় বলবো যে আজো, আজো ওই দৃশ্যগুলো আমার ভারতীয় ছবির সবচেয়ে convincing চুম্বনদৃশ্য মনে হয়। যদিও কথাটা আমি নিজেই বলছি, তবু...

আর্যনীলঃ

একদম, এবং দারুণ artful ওই দৃশ্যগুলো...

ধৃতিমানঃ

কিন্তু আমার নিজের অস্বস্তি বা দোনামনা ভাব থাকলেও রীনা কিন্তু বারবার বলছিলো -'Trust me' । আর সত্যিই তাই হলো শেষ পর্যন্ত। She does have this disconcerting habit of saying 'Trust me' even when there's chaos all around but it always works out. '১৫ পার্ক এভিনিউ'তেও এক ব্যাপার।

নবাগতা হিসেবে রীনা কিন্তু এক অত্যন্ত কুশলী পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছিলো। ও ওর শট-ডিভিশন, ক্যামেরার কোণ, অভিনেতা/অভিনেত্রীর থেকে ঠিক কী চায় - এই সমস্ত কিছু সম্বন্ধেই একেবারে সুনিশ্চিত ছিলো। এবং তাই নয়, নান্দনিকতা সম্বন্ধেও ওর একটা পরিস্কার ধারণা ছিলো। যেটা কিনা সত্যজিত, চিদানন্দ দাশগুপ্তর ঘরানা একেবারেই। আর অশোক মেহতার সাথে ওর টিম-করাটা একটা দুর্ধর্ষ ব্যাপার।

নিজের ব্যাপারে বলবো, আমি এইভাবে বা এইরকম কাজ এর আগে কখনো করিনি। 'চ্যালেঞ্জ' শব্দটা এত বহুব্যবহৃত, সেটা বলবো না, বরং 'মজা' বলি। যদিও সেটাও কিছু কম ব্যবহৃত নয়। একটু আগে যেটা বলছিলাম, সেই ঠিক 'নোট'টা, 'স্বর'টাকে ছুঁতে পারা চাই। 'সমরেশ মৈত্র' তরুণ, আকর্ষণীয়, প্রায় বিবেকহীন

এক কর্পোরেট-টাইপ। আর এটাও আমাকে মনে রাখতে হয়েছিলো যে আমার তখনকার বয়সের চেয়ে কিছুটা ছোটো একটি ছেলের চরিত্রে আমি অভিনয় করছি। এছাড়া আমি মন দিয়ে দেখেছিলাম কীভাবে একজন তার ছবি করছে ... and I thoroughly enjoyed myself in the company of people I liked.

আলোকচিত্রঃ ভি এস রাঘবণ

আর্যনীলঃ

ধৃতিমানদা এখানে একটু অবান্তরবাদী হচ্ছি। আচ্ছা, আপনি যে মাঝে মাঝে আড্ডার সময় কিছু পুরনো ছবি সম্বন্ধে বলেন, “the film looks dated” বা ধরুন বললেন “the film didn’t age well”... একটু বুঝিয়ে বলবেন এই ব্যাপারগুলো... ধরুন **‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’**ছবিটা...

ধৃতিমানঃ

‘অবান্তরবাদী’?... বাবা, আমার পক্ষে খুব কঠিন বাংলা হয়ে যাচ্ছে... (হাসি)... কোনো বিশেষ দর্শন নয় তো?

আর্যনীলঃ

(হাসি...) না, এটা আমার শব্দ। অনেকের পক্ষেই ধরা শক্ত। মানে বলতে চাইছি – digressive...

ধৃতিমানঃ

যে ছবির আইডিয়া বা প্রতিমা আমার আজকের আমিকে, যে আমির বোধ ও স্নায়বিকতার মধ্যে হয়তো অজস্র পরিবর্তন ঘটে গেছে, তবুও অনুরণিত করছে, করতে পারছে, সেই ছবিটাই সমসাময়িক। অন্যদের কথা বলতে পারবো না, তাদের হয়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব না। একটা ছবি, বা চিত্র বা নাটক, কি নভেল – এগুলোকে

তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিকতায় আমি পড়তে পারি, কিন্তু আজ হয়তো তারা তাদের আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

যেমন ধরো, অপু-ট্রিলজিতে আমি বারবার ফিরে যেতে পারি, কাঞ্চনজঙ্ঘা-তে পারি না। আমি বুঝতে পারছি মানিকদা সেই সময়ে কী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ সেসব কিছুটা formulaic মনে হয়। খুব প্রত্যাশিত। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’? হ্যাঁ, আমি ফিরে দেখতে পারি; ‘জন-অরণ্য’? পারিনা, যদিও ছবিটার মধ্যে একটা অন্ধকারাচ্ছন্নতা আছে – রূপকী এবং আক্ষরিকভাবেও, যেটা একটা সময়ে আমার ভীষণ ভালোলাগতো।

একইসঙ্গে এটা বলবো যে বেয়ারম্যান ও ফেলিনির বেশিরভাগটা, মানিকদা ও মৃণালদার বেশিরভাগটা আমার কাছ কালোত্তীর্ণ। থিম বলো, visual texture বলো – কিছু জিনিস ওদের ছবিতে আছে যার কোনো তুলনা নেই। মৃণালদা, যাঁর প্রজ্ঞা নিয়ে সন্দেহের জায়গা নেই, যদিও তিনি সেটা আড়াল করতে চেষ্টা করেন, একবার আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন – ‘সমসাময়িক মানেই কিন্তু তথাকথিত ‘আধুনিক’ না, সমসাময়িক অতীতের কথাও বলবে, কিন্তু আধুনিক সচেতনতা নিয়ে বলবে।

আমি বরং বলি যে কোনো ছবি থেকে পাওয়া একটা প্রতিমা, চিত্রকল্প, একটা মুহূর্ত, চাহনী, একটা মন্তব্য, আইডিয়া যদি আমার কাছে কোনো অপ্রতিরুদ্ধ মুহূর্তে ফিরে আসে, সেই ছবিটা আমার কাছে কালোত্তীর্ণ।

আর্যনীলঃ

ধৃতিমানদা, আমি লক্ষ্য করি ফিল্মপ্রেমী যে সমস্ত সাহিত্যাগ্রহী মানুষ রয়েছেন, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে, বা এখানে বড় হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আপনার সম্বন্ধে একটা গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। রয়েছে এক সৃষ্টিশীল, চিন্তাশীল অভিনেতা হিসেবে এবং এক সমাজ-রাজনীতি সচেতন শিল্পী হিসেবে। মানে, আমি এখানে অকারণে সপ্রশংস বা hagiographic হতে চাইছিনা, যা দেখেছি তাই বলছি। আপনি বহুবিষয়ী, বহুক্ষেত্রগামী। যেমন ধরুন প্রথমেই আপনি অর্থনীতির খুব ভালো ছাত্র, অনেকদূর পড়াশোনা করেছেন, প্রতিভাবান অথচ বারোয়ারি নয় এমন এক অভিনেতা – একাধিক ভাষায়, পর্দায় ও মঞ্চে, বিজ্ঞাপন জগতের গুরু, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন, ভ্রামক, আবৃত্তিকার, যৌথশিল্পী, পৃথিবীর বহু দেশে গেছেন এবং বিশ্বজগত ও নানা বিষয়ে অসম্ভব কৌতূহলী ইত্যাদি...

ধৃতিমানঃ

ব্যাস ব্যাস! আর বলতে হবে না, বুঝে গেছি...

আর্যনীলঃ

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে অবান্তরবাদী (digressive), বহুবিষয়ী আগ্রহ, যেটা আমরা জানি অনেক অভিনেতার থাকে – যেমন ডাস্টিন হফম্যান (Dustin Hoffman), মারচেলো মাস্ত্রোয়ানি (Marcello Mastroianni),

এরল্যান্ড যোসেপসন (Erland Josephson) প্রমুখ – এই প্রবৃত্তিগুলো আপনাকে অভিনয় জীবনে কীভাবে সাহায্য করে?

আলোকচিত্রঃ গনেশ বাবু

ধৃতিমানঃ

প্রথমেই বলি 'অর্থনীতির খুব ভালো ছাত্র' কথাটা অতিকথন হয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিক প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়েছিলাম। তারপর Delhi School of Economics-এ পড়ি কে এন রাজ, তপন রায়চৌধুরী, জগদীশ ভাগবতী, অমর্ত্য সেন – এঁদের কাছে। তার আগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও গিয়েছিলাম। সেখানে ভোর সাতটায় ক্লাস শুরু হতো, তায় ক্লাসে মাত্র ৩টি ছাত্রী। তাই ছেড়ে দিলাম… (হাসি)

আর্যনীলঃ

৩টি ছাত্রী?… সে তো দারুণ ব্যাপার! আমাদের সময় তো এর প্রায় কুড়ি বছর পর, একটিও ছাত্রী নেই… (হাসি…)

ধৃতিমানঃ

…আসলে আমার জীবন সেভাবে কোনোদিনই খুব পরিকল্পিত ছিলো না। কেরিয়ার, সার্থকতা, সাফল্য – এসবের চেয়ে অভিজ্ঞতাটাই আমার কাছে বড় ছিলো। মানিকদা, কিছু পরে মৃণালদার সাথে যখন কাজ করছি, আমি কিন্তু তখন পুরোদস্তুর চাকরী করি, বিজ্ঞাপন জগতে, আর সে চাকরী করতে খুব ভালো লাগে।

এখন দেখো, সমস্ত নির্বাচনেরই কিন্তু একটা উঁচু-নিচু আছে। আমার উঁচুর দিকটা ছিলো রোল বেছে নেবার বিলাসিতা, নানা রকমের ভ্রমণের মাধ্যমে অল্পবিস্তর জীবন দেখা, ছবি বানানো, কর্পোরেট ভারতকে উঁকি দিয়ে এক ছিলিম দেখা, কলকাতার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের এটা-সেটা দেখা, এলোমেলো বারে ঢুঁ মারা – এই আর কি! আর নিচুর দিকটা হলো এই যে বাংলা ফিলিম-ইন্ডাস্ট্রি যাকে বলে, তারা ঠিক আমাকে নিজের লোক কোনোদিন ভাবেনি। আজও ভাবেনা।

তবে কি! এই যে টোকা মারা, টুঁ মারা – এগুলোর কিন্তু কিছু সুবিধে আছে। এতে একটা সচেতনতা তৈরি হয়ে যায়। এমন একটা সচেতনতা যাকে কাজে লাগানো যায়। সেটা আমি করতাম। মানে, একটু বুঝিয়ে বলি। মানে, এই নয় যে একজন ইস্কুলমাস্টার, কি একজন ডাক্তার, কৃষককে নিপুণভাবে নকল করতে শিখলাম। বরং তার জীবনের সাথে একটা যুক্ততা, এক ধরনের প্লবতা, যা অভিনেতার কাজকে উপরিতলে ঠেলে তুলে দেয়। বিশেষত তার চোখে সেটা ধরা পড়ে। ধরা পড়ে দর্শকের চোখেও।

আর্যনীলঃ

দুর্দান্ত!...

'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে ফিরে যাই। চার দশক পেরিয়ে গেলো। এখন, আজ, এখান থেকে দেখলে, আপনার মতে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে সত্যজিতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কোনটা?

ধৃতিমানঃ

৬০-এর শেষ, ৭০-এর গোড়া - এই সময়টা কলকাতা, বাংলার ইতিহাসে একটা উত্তাল সময়। পৃথিবীর অন্যত্রও... প্যারিস, মে-৬৮ ইত্যাদি। ১৯৬৭-৬৯-এর মধ্যে মানিকদা 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'গু-গা-বা-বা', 'চিড়িয়াখানা' করেছিলেন। কিন্তু একটা সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছিলেন – এই যে সমসাময়িক বাস্তবতাকে উনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। ঠিক এই সময়েই 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। ছবিটা দুটো জিনিস করেছিলো - One, it reflected the frustration, anger, confusion, directionlessness of contemporary urban youth, without providing any easy answers, আর দুই, একটা চিত্রভাষা তৈরি করতে পেরেছিলো যেটা মানিকদার কাছ থেকে এর আগে আমরা কখনো পাইনি। মানে, আমি বলতে চাইছি, it was gritty, edgy, immediate - handheld ক্যামেরার ব্যবহার ছিলো, জাম্প-কাট, ফ্রিস-শট ইত্যাদি যেগুলো ফরাসী নিউ-ওয়েভের কথা বা মৃণাল সেনের কথা মনে করাবে, যে ভাষাটা ঠিক সত্যজিত রায়ের স্বাক্ষরভাষা নয়...

আর্যনীলঃ

আর কিছু নেগেটিভের ব্যবহারও...

ধৃতিমানঃ

হ্যাঁ...কিন্তু এই মৌলগুলোর কোনোটাই কিন্তু খুব সাঙ্ঘাতিক নতুন কিছু নয়। কিন্তু এগুলোকে উনি খুব মসৃণভাবে গেঁথে তুলেছিলেন এমন এক ছবিতে যেখানে আধার আর আধেয়র মধ্যে একটা চমৎকার ভারসাম্য এলো। এক নিখুঁত ভারসাম্য। আর তাই আজ, পেছন ফিরে তাকালে, ছবিটাকে ওই সময়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক মনে হয়, it

became a cult film. কোনো বুদ্ধিমান চিত্রপরিচালকই কিন্তু 'আমার সময়ের প্রতিনিধিত্ব করবে এমন একটা ছবি করবো এবার' - এইরকম ভেবে কাজ শুরু করতে পারে না। কিন্তু 'প্রতিদ্বন্দ্বী' দেখো... ছবিটা যেন ৬০-দশকের কলকাতার আয়না। সত্যিই একটা ছবি টিঁকবে কি টিঁকবে না, কতোটা টিঁকবে - এ এক গভীর রহস্যের ব্যাপার। এখনো কলেজের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা এসে আমাকে বলে ছবিটা তাদের কাছে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। ৪০ বছর পরও ছবিটা যেন ওদের জীবনের অংশ। 'সমসাময়িক' মানে এটাই। যেমন মৃণালদার কলকাতা নিয়ে ছবিগুলো...

আর্যনীলঃ

...আর আপনার নিজের কাজ সম্বন্ধে? পরিতৃপ্ত লাগে?... একটা কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়। সেটা হলো, ওঁর যেসমস্ত ছবিতে নতুন অভিনেতাকে নিয়ে কাজ করেছেন সত্যজিত, সেই সমস্ত ছবিতেই কিন্তু এই নতুন অভিনেতাদের সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। প্রথম কথা তাদের – স্ক্রীনলেন্থ, তারপর তাদের মাননিক জটিলতা। নবাগতদের কাছে এ তো সাঙ্ঘাতিক চ্যালেঞ্জ। তাই না? 'অপুর সংসার'-এর সৌমিত্র, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র আপনি, 'সীমাবদ্ধ'-র বরুণ চন্দ, 'জন-অরণ্য'-র প্রদীপ – সবার ক্ষেত্রেই সত্যি। আবার এদের পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে মনে হয় 'অপু' হয়তো জটিল চরিত্র কিন্তু এক ক্লাসিক বাঙালী। সে অর্থে খুব চেনা। 'সীমাবদ্ধ'র শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি ৭০-এর গোড়ার দিকে, তখন, অতোটা চেনা নয় কিন্তু predictable। 'জন-অরণ্য'র সোমনাথও খুব চেনা চরিত্র। এদের পাশে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সিদ্ধার্থ ভীষণ নতুন, সমসাময়িক, অমীমাংসিত ও অপরিচিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার আমায় বলেছিলেন, 'সিদ্ধার্থ আসলে বিচ্ছিন্নবাদী'। কিন্তু শুধু 'বিচ্ছিন্নবাদী' বললেই কি তার সমস্ত জটিলতার ব্যাখ্যা মেলে? বিশেষ করে সিনেমার সিদ্ধার্থ, যে উপন্যাসের নায়কের চেয়ে কিছুটা আলাদা।

ধৃতিমানঃ

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি অন্যত্র অনেক কিছু বলেছি, তাই এবার একটু ছোটো করেই বলি... আমার কি মনে হয় জানো? ... এটা আমার ধারণা যে মানিকদা ওঁর মূল চরিত্রগুলোকে আগে কাস্ট করতেন, তাদের ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতেন, তারপর... তাদের সংলাপ লিখতেন। ওঁর direction -ও এর ফলে, ছিলো খুবই minimal। উনি তোমায় তোমার নিজের মত কাজ করতে দিতেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না ওঁর মনে হতো you are really fucking it up। কোনো কোনো অভিনেতাকে অবশ্য উনি যন্ত্রের মতো নির্দেশ দিতেন, মানে প্রত্যেকটা পা ফেলা, মাথা ঘোরানো, চোখের চাহনী ইত্যাদি। সৌভাগ্যবশত আমার ক্ষেত্রে সেটা কখনো হয়নি।

এটা আমি আগেও অনেক জায়গায় বলেছি যে আমি কিন্তু নিজের রোলকে একেবারেই intellectualise করিনা, বা সে সম্বন্ধে খুব একটা agonise করিনা। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র ক্ষেত্রে গল্পের নায়ক আর আমি, দুজনের আর্থ-সামাজিক নেপথ্য এক। গল্পের প্রায় সব চরিত্রকেই আমি মোটামুটি ভালোই চিনতাম। ছবিতে সিদ্ধার্থ যা যা করে, যেভাবে

কথা বলে, এর থেকে যে কোনো ইডিয়টের কাছেই এটা পরিস্কার হওয়া উচিত যে সবকিছুই সহজ, সরল আর কিছুটা low-key রাখার দরকার হচ্ছে... আর আমি সেইটাই করেছিলাম, ব্যাস!

আর্যনীলঃ

শ্যুটিঙ চলাকালীন কিছু খুঁটিনাটি কাহিনি-উপকাহিনি ইত্যাদি... এমন কিছু বলুন...

ধৃতিমানঃ

একটা মজার গল্প বলি তাহলে। ছবিটার প্রথমদিকে একটা স্বপ্নদৃশ্য আছে না! খুব জটিল এক স্বপ্নদৃশ্য... সাগর সৈকতে... সে এক বিরাট সেট তৈরি হয়েছে... ভাবো, অল্প বাজেটের ছবি, তার জন্য ম্যাসিভ সেট। আমি ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি, পেছনে বাস পুড়ছে, আমার বোন নার্সের পোশাক পরে আমার দিকে দৌড়ে আসছে... তা সে যাইহোক, প্রথম শট নেওয়া হয়ে গেছে, মানিকদা 'ওকে' করে দিয়েছেন, এমন সময় দেখি ওঁর এক সহকারী দৌড়ে আসছে ওঁর দিকে। সে এসে খানিকটা কিন্তু কিন্তু করে ওঁকে ফিসফিস করে বলছে যে শটটা আর একবার নিতে হবে কেননা নায়িকার চুল থেকে একটা হেয়ার-ক্লিপ তার কানের পাশে ঝুলছিলো। মানিকদা ওঁর বিখ্যাত গগনবিদারী হাসি হেসে অবলীলাক্রমে বললেন, "ও ঠিক আছে, ড্রিম সিকোয়েন্স তো! দেখবে সমালোচকরা ক্লিপ-এর ঠিক একটা মানে খুঁজে বের করেছে"।

আর্যনীলঃ

পীয়ের-আঁদ্রে ব্যুতাং-কে ১৯৮৯ সালে দেওয়া এক ভিডিও সাক্ষাতকারে সত্যজিত এক জায়গায় বলছেন – 'for me its the density of the film that is most important, how much material one can pack into a film'। আজকের প্রজন্মের বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রেমী বাঙালী কবিদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করি এইরকম একটা প্রবণতা জন্মাচ্ছে। অর্থাৎ কত কম পরিসরে লেখাকে নানারকমের চিন্তা ও মননসম্পদ দিয়ে গভীর ক'রে তোলা যায়। কবিতা মানেই কেবল আবেগ আর অনুভূতির কাপে চামচ নাড়া – এই ধারণা থেকে এরা সরে এসেছে। অথচ এতসব মিল সত্ত্বেও এক একটা শিল্প কিন্তু অন্য শিল্পের সাথে বাক্যালাপ বন্ধ করে ব'সে থাকে – এটা কেন হয়? আপনার কি মনে হয়?

ধৃতিমানঃ

How curious that you can change the letters in 'density' around to spell 'destiny'! তুমি যে প্রসঙ্গটা তুলছো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। এ নিয়ে বেশ কয়েক ঘন্টা কথা বলা যায়। কিন্তু সে সময় বা জায়গা তো নেই। কাজেই ছোটো করে বলি...

প্রথমতঃ, মানিকদার কথা বলি। একবার এই নিয়েই ওঁর সাথে এক সুদীর্ঘ আলোচনা হয় - আজ যেমন হচ্ছে। এসব আলোচনা হয় ঠিক 'গণশত্রু'র পর পর। প্রায় দু-তিন ক্ষেপে। আমি ওঁর সাক্ষাতকার নিয়েছি আগে বেশ কয়েকবার। কাজেই আমরা এবার ঠিক করি যে সিনেমা নিয়ে কম কথা বলবো বরং অন্যান্য বিষয় নিয়ে বেশি - সঙ্গীত, পরিবেশ-প্রকৃতি, রাজনীতি, এমনকি আধ্যাত্মিকতা... যে বিষয়ে, তোমায় এইবেলা বলে রাখি, সত্যজিতের কিন্তু স্পষ্ট, নিজস্ব ভাবনা ছিলো! যাইহোক, আমরা এইসব নিয়ে কথা বলছি, ধ্রুপদী সঙ্গীত নিয়ে, বিশেষ করে কানাড়ী সঙ্গীত, এবং ওখানে যে 'রসিক'র ধারণাটা আছে, সেই নিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কানাড়ী সঙ্গীতরস পেতে গেলে যেমন 'রসিক' হতে হয়, সিনেমার ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম খাটবে না কেন?

ওঁর উত্তরটা ছিলো ভাববার মতো। উনি নিজের ছবিকে আস্তরে বাঁধতেন - layered - যাতে করে ওপর-ওপর দেখা যায় যেমন, যিনি 'রসিক' তিনি কিন্তু আস্তর ভেঙে ভেঙে অনেক ভেতরে যেতে পারেন, ছবিটাকে ডিকোড করতে পারেন আরো রসাস্বাদনের জন্য। কাজেই বুঝতেই পারছো, ওঁর ছবিতে packing material was not an easy exercise। একটা জিনিস উনি পরিস্কার করে ভাবতেন সবসময় - যে মধ্যবিত্ত বাঙালী দর্শকের প্রতি ওঁর একটা দায়িত্ব আছে, আর প্রযোজকের প্রতি এক অর্থনৈতিক দায়িত্ব। উনি কিন্তু একজন দুর্বোধ্য আন্ডারগ্রাউন্ড চলচ্চিত্রকার ছিলেন না যিনি কিছু মাস্টারপিস তৈরি করতে চান যা তিনি নিজেই কেবল দেখবেন।

কিন্তু আমরা আজো ওঁর ছবি দেখি, সব না হলেও, বেশ কিছু, বার বার দেখি, ওই জিনিসিটার জন্যই - 'ঘনত্ব'। ঘনত্ব আছে বলেই। প্রত্যেকটা ফ্রেম মন দিয়ে দেখি আমরা। আমাদের চোখ খোঁজে - নতুন অর্থ-প্রতিবার, ডিকোড করতে চায়। আর করতে পারলে সেই সদ্য-পাওয়া-তাজা অর্থ নিয়ে আমরা বেশ কিছুদিন মেতে থাকি। কাজেই, ঘনত্ব আছে তো বটেই, with a purpose. The purpose is the narrative.

কাজেই, সিনেমা ও কবিতা কিন্তু ভিন্ন ফর্মাট, ভিন্ন দর্শক, ভিন্ন তাগিদ নিয়ে কাজ করে।

দ্বিতীয় কথা - 'আবেগ অনুভূতির কাপে চামচ নাড়া' সম্বন্ধে যা বললে সেই প্রসঙ্গে বলি। তুমি বলছো কিছু কবি এক ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন - ছোটো এক পরিসরের মধ্যে ঘন এক মাননিকতা 'প্যাক' করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। খুব ভালো কথা। তাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইলো। কিন্তু এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে আজকের সিনেমার কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হবে কেন? আজকের সিনেমা, এটা তো খুবই পরিস্কার হয়ে গেছে - has become a means to an end, that end being the telling of a story।

আর্যনীলঃ

না, আমি কিন্তু তা বলতে চাইছি না। একটা শিল্পে কোনো এক সময় হয়তো এক ধরনের তাগিদ তৈরি হলো – তার পেছনে অবশ্যই আর্থ-সামাজিক কারণ আছে। অন্য একটা শিল্পে দেখা গেল সেই একই ধরনের কিছু devise, কিছু প্রক্রিয়া, কিছু তাগিদ তৈরি হচ্ছে। হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন আর্থ-সামাজিক-নান্দনিক-শৈল্পিক কারণে। কিন্তু যেহেতু তাগিদটা একরকমের, তাদের মধ্যে আদান-প্রদান গড়ে ওঠাটা কি স্বাভাবিক না? যেমন ধরুন, কিউবিসম-এর গোড়ার দিকে পিকাসো ও তার বন্ধুরা প্রচুর পরিমাণে engineering drawing study করতেন। শৈলিগত মিলের কারণে। রাইনার মারিয়া রিলকের যখন লেখা বন্ধ হয়ে যায় একসময়, উনি পারীতে এসে অগুস্ত রঁদার সচিব হয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন। রঁদার নিরন্তর কাজ করে যাবার ক্ষমতা, ওঁর ভাস্কর্য থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত পেয়েও যান।

ধৃতিমানঃ

এ প্রসঙ্গে একটু পরে যাচ্ছি, আর একটা ব্যাপার মাথায় এলো বলি। পরীক্ষামূলক কবিতার ক্ষেত্রে ‘ইনসাইডার’/’আউটসাইডার’ ব্যাপারটা কিন্তু আছে। তোমরা কবিরা কতোটা মানতে চাও বা নিজেদের গন্ডীকে প্রসারিত করতে কতোটা সচেষ্ট জানিনা। যে সব বিদ্বান চলচ্চিত্রকারদের সাথে আমি কাজ করেছি, তাঁদের সাথে স্বভাবতই নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু কবিতা নিয়ে হয়েছে এমনটাতো মনে পড়ে না। কেন বলোতো?

আর্যনীলঃ

আমার যেটুকু ধারণা তাতে মনে হয় এটা অন্য অনেক দেশে এটা ঘটে। এখানে কম। বর্তমানে আরো কম। আমাদের দেশ, কাল, সমাজ, শিক্ষার গোটা মডেলটাই তো আমেরিকার মতো হয়ে যাচ্ছে যেখানে জনসমাজে ‘কবিতা’-র কোনো জায়গাই নেই। বাজারভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় যে জিনিসের বাজারদর নেই তার আর ভবিষ্যত কী? ৫০-৭০ এর দশকে রাশিয়ায় তো ছিলো। কবিতার এক রমরমে জায়গা। সেটাও আর নেই।

ধৃতিমানঃ

কবিতার গ্রাহকদের দিক থেকে এটাও বলতে হয় হাজার হাজার বছর ধরে কবিতা একটা পারফরমেন্স আর্ট। সেই ঐতিহ্যটাকে তোমরা বহন করবে না বর্জন করবে? আমি জানি না, জিজ্ঞাসা করছি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পড়াশোনা আমার যতোই সামান্য হোক, আবৃত্তি করতে আমার ভালোলাগে। আর তার জন্য সবসময় যে শ্রোতা লাগে এমনও নয়। আমি সব সময়েই চেষ্টা করি আবেগ-অনুভূতির কাপ থেকে চামচটাকে সরিয়ে নিতে। শব্দকে, তার বাঁধুনিকে, ভাষাকে অগ্রাধিকার দিতে। আমাদের নাটকের দলে যখন নাটক পাঠ করি, তখনো তাই। আমার মনে হয় নাট্যপাঠকে poor man’s theatre মনে করার কোনো কারণ নেই, পাঠ আর অভিনয় সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

কিন্তু এইজন্য কবিদের সহযোগিতাও তো প্রয়োজন। সেইটা পারফর্মাররা পাচ্ছেন কি? জানিনা, জিজ্ঞেস করছি।

আর্যনীলঃ

আপনি তো এটা যুক্তরাষ্ট্রে দেখেছেন। ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, অন্যত্রও তাই। পারফরমেন্স পোয়েট্রির একটা জায়গা আছে। আমাদের বাংলায় সেটা ‘আবৃত্তি’। এখন আপনি ‘পাঠ’ করেন আমি জানি, কিন্তু বেশিরভাগ আবৃত্তিকারই গলা-টলা কাঁপিয়ে সুর করে নাটুকে ভঙ্গিতে কবিতা পড়ে। এটা অধিকাংশ কবিরই কিন্তু ভালোলাগে না। যে কবি যে কোনো মূল্যে পাবলিসিটি চায়, তার লাগে কেবল। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো শম্ভু মিত্র যেমন আবৃত্তি শিল্পের প্রবর্তক, তেমনি এটাও ঠিক যে তিনি কবিতার ক্ষতিও করেছেন। কবিতাপাঠের মধ্যে নাটুকেপনা নিয়ে এসে। যে কবিতা কাব্যনাটক নয়, তাকে নাটক করে তোলা কেন?

ধৃতিমানঃ

এবার তোমার আগের কথায় ফিরি - দেখো, কবিতা আর সিনেমার মধ্যে তাগিদ বা শৈলিগত মিল, বিশেষ করে আমাদের প্রসঙ্গে, আমি ঠিক ধরতে পারছি না। হয়তো আমার বোঝার ভুল। পারস্পরিক ভালোলাগালাগির একটা ব্যাপার তো থাকতেই পারে। এবং ঘনত্বর কথা, শব্দ ও প্রতিমার প্রতি নিষ্ঠার কথা, এগুলো সত্যি। কিন্তু উদ্দেশ্য, দর্শক বা গ্রাহক – এসবের মধ্যে এতটা ফারাক রয়েছে... তারপর ধরো attitude ... কাজের ব্যাপারে কবিরা অন্তর্মুখি হন, অন্তত দিনের বেলা, ফিল্মওলাদের অতোটা অন্তর্মুখি হলে চলেনা। তোমার প্রশ্নটা আমি উড়িয়ে দিতে চাইছি না একেবারেই। একটু গভীরে গিয়ে অন্যত্র আলোচনা করতে হবে বোধহয়।

আর্যনীলঃ

শিল্পীস্বভাবের ব্যাপারে যা বললেন নিদারুণ সত্যি। কবির আসল কাজটার প্রায় সবটাই তো একাকিত্বে। আর চিত্রপরিচালক বলতেই আমার মনে হয় যে ব্যক্তি বন্ধুবৎসল নয়, যার সোশাল-স্কিল নেই, ম্যানেজমেন্ট স্কিল নেই সে কী করে চিত্রপরিচালক হতে পারে...

ধৃতিমানঃ

তাছাড়া কি জানো? আমার মনে হয় কবিতা এখনো খুব স্বাধীন, অটোনমাস এক শিল্প যে তার নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিজের মতো, নিজের নিয়মে চালাতে পারে। এবং শুদ্ধ শিল্প কেননা কোনো জীবিকার ওপর নির্ভর করে না। এই যে এক বৃহত্তর দর্শক বা শ্রোতা – তাদের address করার তাগিদ কবিতার নেই। একটা ছোট পাঠকশ্রেণীকেই উদ্দেশ্য ক'রে এঁদের কাজ, এবং এই কাজ তাঁদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি দিচ্ছে, এটাই বড়ো কথা।

একদিন সিনেমাও এইরকম ছিলো, কিন্তু খুব বেশি লোক সেই সিনেমার সাথে যুক্ত ছিলেন না। আগে সিনেমা এরকম ছিলো, বিশেষ করে ইউরোপে, যখন সিনেমা অনেক বেশি innocent ছিলো, বানিজ্যের মারপ্যাঁচগুলো জানতো না। এখনো কিছু কিছু সিনেমা ওইরকম আছে, কিন্তু খুব বেশি লোক সেই সিনেমাকে আমল দেয় না। ওই যে গোদার সম্প্রতি বলেছেন না - 'Films are being made, but the cinema is dead'। আমি ঠিক অতোটা নিরাশাবাদী নই, তবুও...

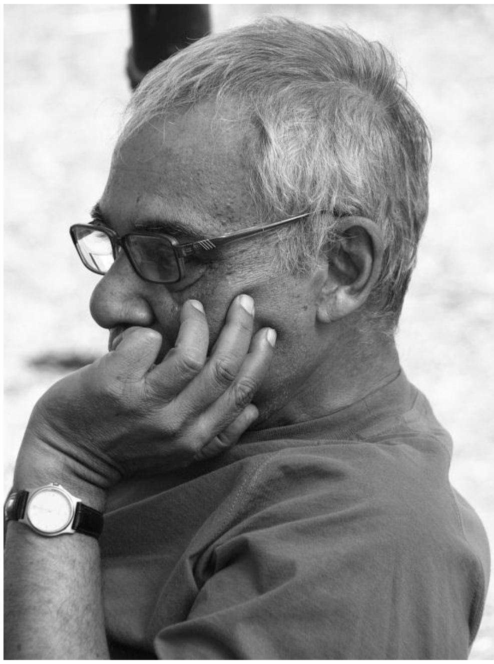

আলোকচিত্রঃ পাবলো চট্টোপাধ্যায়

আর্যনীলঃ

আপনার কথায় বিমানশিল্পের কথা মনে চলে এলো। ভেবে দেখুন বিমান আর সিনেমা প্রায় এক বয়সী। রাইট ভাইরা (Wright Brothers) ১৯০৫ সালে প্রথম প্লেন ওড়ান। আর মানাকি ভাইরা (Manaki Brothers) সেই বছরই প্রথম তথ্যচিত্র তুলছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এমন এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার বিমান, অথচ বছর কুড়ি ঘুরতে না ঘুরতেই মানুষ ভেবে ফেললো – এটাকে মারণাস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। কয়েকবছর আগে Lawrence Ferlinghetti ওঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ Americus I–এ লিখেছেন এ প্রসঙ্গে “soon it (aeroplane) fell into the hands of the Wrong Brothers”।

ধৃতিমানঃ

... আর তুমি যে তৃতীয় প্রসঙ্গটা তুললে, সেখানে আসি এবার। এক শিল্পের সাথে অন্য শিল্পের যোগাযোগ। হ্যাঁ, নিশ্চিত, এতে নতুন কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক। আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করেন – আপনি ছবি পরিচালনা করেন না কেন? আমি বলি, সবাই ছবি বানালে দেখবে কে? because filmmakers don’t- except sometimes to borrow ideas from, যেমন বলি, আমি এক শিল্পীদের কলোনীতে থাকি, এবং সেখানে সময় সময় দেখি একজন শিল্পী অন্যজনের শিল্পকর্ম দেখতে গেছেন তার কতো দাম উঠলো জানতে! না, এটা এমনি মজা করছি। সবসময় সিরিয়াস হলে চলে! কিন্তু সত্যজিতের ওই সাক্ষাতকার থেকে যে বক্তব্যটা তুমি তুলে নিয়েছো এবং সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার কিছু প্রবণতার সাথে যে তুলনা এনেছো সেটা আমার কাছে untenable মনে হয়েছে,

desirable, but untenable. Cinema is still a means to an end. It isn't brave or liberated enough to do these things.

আর্যনীলঃ

আপনার সাথে আমার আলাপ হয় এই বিষয় নিয়ে, তাই প্রসঙ্গটা এখানে তুলি। মোটামুটিভাবে বিশ শতকের সিনেমা, মানে কাহিনিচিত্র, সাহিত্যভিত্তিক। অথচ আস্তে আস্তে ফিল্মের প্রভাব এমন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে যে এই সময়ের অনেক কবির মধ্যেই এটা লক্ষ্য করি – যে তাদের অনুপ্রেরণার একটা সূত্র সিনেমা। তাই ভাবি, যে এই যে সাহিত্যের ওপর সিনেমার হেলান (gradient), সেটাকে কি উলটে দেবার সময় এসেছে? সাহিত্যের ওপর সিনেমার প্রভাব বাড়ছে কি? বিশেষ করে তার ভাষার ওপর?

ধৃতিমানঃ

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবো কিনা সেটা আমার জানা নেই, তবে একটা চেষ্টা করি, আর নিজের কিছু ভাবনার কথা বলি। একজন কবি, এক ঔপন্যাসিক, কোনো একজন চিত্রকর, একজন আলোকচিত্রি এবং এক চলচ্চিত্রকার যখন একটা গাছের দিকে তাকান, তাঁরা কি একরকমভাবে তাকান? একই জিনিস দেখতে পান? হয়তো পান, কিন্তু তাঁদের এই নিজস্ব দেখাটা যখন তাঁরা তাদের নিজস্ব মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার কথা ভাবেন, তখন কীরকমের ধ্যান বা তপস্যায় তাদের মন বুঁদ হয়ে ওঠে? সেই ধ্যানটা কী একরকমের? তাঁদের দেখাটা আর তার প্রকাশটা – এই দুটোই কি স্বতোস্ফূর্ত? অন্তত অর্ধচেতনভাবে তাঁদের নিজেদের শিল্পমাধ্যমের একটা আভ্যন্তরীণ 'গুণ' কি তাঁদের নিজেদের শিল্পকে প্রভাবিত করে না?

তথ্যচিত্র বানানোর একেকটা সময়ে এরকম হয়, আমরা একটা জ্যান্ত সমস্যার সম্মুখীন হই - এই যে - জিনিসটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, খুব অবভিয়াস, এখন এটাকে কীভাবে দেখাই? তাহলে তখন কী করণীয়? তুমি একটা মাধ্যম থেক কিছু উপাদান নিলে; নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য একটা মাধ্যমে অনুসৃজন বা পরিসৃজন করলে। কখনো জিনিসটা ভালো হবে, কখনো হবে না। যেমন ধরো সেদিন আমি টিভিতে একটা দুর্দান্ত ভ্রমণচিত্র দেখলাম, যেখানে কথক খুব জটিল কিছু আইডিয়া দিচ্ছেন। আমি মনে মনে ভাবলাম - 'এরা এসব দেখাবে কীভাবে?' চলচ্চিত্রকার দেখানোর কোনো চেষ্টাও করলেন না। যে অ্যাংকর, সে স্রেফ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কল থেকে একটু জল খেলো আর দর্শকদের সাথে কথা বললো। ব্যাস! এটুকুই।

মানে আমি এটাই বলতে চাইছি যে you do try to shift, superimpose- call it what you will- one medium into another.... যেটা আমাদের আবার কবিতা-সিনেমার আলোচনায় নিয়ে আসছে। যেখান থেকে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিলো কয়েক বছর আগে। তুমি কবিতাকে সিনেমায় রূপান্তরিত করলে ঠিক, কিন্তু সেটা সিনেমাই হলো। তুমি একটু আগে যেটা বললে, সাহিত্য-নির্ভর সিনেমা, কিন্তু সিনেমাই। সাহিত্যকে চাই গল্প বলার প্রয়োজনে। ন্যারেশনের প্রয়োজনে। কারণ? সিনেমা এইই হয়ে উঠেছে - গল্প বলার একটা মাধ্যম। এবং নামী চলচ্চিত্রকারদের মধ্যেও মোটামুটিভাবে এমন একটা বিশ্বাস তৈরি হয়ে গেছে যে চলচ্চিত্রের ভবিতব্য এটাই - ন্যারেট করা।

এখন উল্টো একটা নির্ভরতাও কি সম্ভব? বানিজ্যিকভাবে, অবশ্যই। হাজার হাজার মার্কিন উপন্যাস লেখা হয় বানিজ্যিক সিনেমার কথা মাথায় রেখে। কিন্তু শিল্পগতভাবে? এর উত্তর আমার জানা নেই। দেখো তুমি যেটা

বলতে চাইছো যে কবিতার কাছাকাছি থেকে সিনেমা তার এক নিজস্ব ভাষা গড়ে তুলেছিলো, গল্প-বলা এসে তাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেলো - এর সাথে আমি হয়তো একমত নাও হতে পারি। তবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই with a few honourable exceptions সিনেমার সত্যিই নিজের কোনো ভাষা নেই আজ। কথা ও কাহিনি শোনানোর এটা এক মাধ্যম মাত্র।

এখন এ নিয়ে উদবিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই কিন্তু। হাজার বছরের সাহিত্যের পাশে সিনেমার ইতিহাস কী? বাচ্চা। তার নিজের শেকড়ই যখন কাঁচা, সে কী সাহিত্যকে কাঁধ দিতে পারবে? 'চিত্রভাষা' কাকে বলে - এই নিয়ে যেকোনো দুজন চলচ্চিত্র-বিদ্বানকেও একমত করা দুরুহ except perhaps at an obscure, theoretical level!

তবে এসবের পরেও বলবো কিছু উপন্যাস যখন পড়ি, পড়ার সময়েই মনে হয় 'কী সিনেম্যাটিক!' এর মানে এই নয় যে সেইসব লেখার মধ্যে অসংখ্য প্রতিমা আছে, লেখাগুলো visual in a superficial kind of way, তা নয়, কিন্তু সিনেম্যাটিক মনে হয় কেননা সেইসব লেখা চলচ্চিত্রকারকে এক দুরুহ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। মনে হয় কীভাবে অমুক লোকটার মন বেয়ে উঠে তার চরিত্রের ভেতরে ঢুকবো? শীর্ষেন্দুদার 'ঘুণপোকা' সেইরকম এক উপন্যাস। নবারুণের একটা সাম্প্রতিক উপন্যাস - 'যুদ্ধপরিস্থিতি' আরেকটা উদাহরণ। আর এই লেখাগুলোর মধ্যে ওই ব্যাখ্যাতীত জিনিসটা রয়েছে, যাকে 'সাহিত্যগুণ' বলে, আমার কাছে যার অন্য মানে হলো একগাদা শব্দের অপচয় ছাড়া অপ্রত্যাশিত কিছু শব্দকে পাবার আনন্দ। যেন ছিমছাম, সুসম্পাদিত এক সারি যাদুপ্রতিমা।

আর্যনীলঃ

মৃণাল সেনের **'পদাতিক'**। সে যুগে তো বটেই, এযুগের সিনেমার পাশে রাখলেও খুব অদ্ভুত ওই ছবির চিত্রভাষা। একটা রাজনৈতিক প্লট রয়েছে, তার মধ্যে লিঙ্গ-সচেতনতা, gender war, ডকুমেন্টারি স্টাইল, নানা ধরনের তথ্যায়ন, নিউসরীল, সংবাদপত্রের কাটিং, সাক্ষাতকার, ধারাভাষ্য, আত্মসমীক্ষা – ইত্যাদি মিলিয়ে এমন এক মিশ্র (নিন্দুকে বলবে 'জগাখিচুড়ি') ভাষা যা কিন্তু ২০ শতকের শেষের দিকের বাংলা উত্তরাধুনিক সাহিত্যের কাছে আদর্শ মনে হতে পারে। কিন্তু ৪০ বছর আগে এসবের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছবির নায়ক হিসেবে আপনার কি মনে হয়েছিলো?

ধৃতিমানঃ

দারুণ লেগেছিলো। আমি ওঁকে ভালো করে চিনতাম তার আগে থেকেই। এর আগে 'ইন্টারভিউ'তে আমার কাজ করার কথা ছিলো। সেটা আর হয়নি। কিন্তু তখনই একরকম ঠিক হয়েছিলো যে ওনার সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে আমি কাজ করবো। মৃণালদার সাথে কাজ করা মানে ছবি তৈরির গোটা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়া, যদি ইচ্ছে থাকে। স্ক্রিপ্ট, সিচুয়েশন ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। এমনকি শ্যুটিঙ শেষ হবার মাত্র কয়েকদিন আগেও, কেউ, এমনকি ছবির পরিচালকও জানতেন না ছবিটা কীভাবে শেষ হবে। এই অনিশ্চয়তা এমন একটা টেনশন তৈরি করতে পেরেছিলো যার কোনো তুলনা নেই।

ইতিমধ্যে, আমি পাশ করে বেরিয়েছি ৬৯ সালে। চারপাশে যা ঘটছে তখন, সেসব সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান। আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত যেসব বন্ধু, তাদের সাথে এসব নিয়ে নিরন্তর আলোচনা, তর্ক হচ্ছে। কাজেই ‘পদাতিক’-এ অভিনয় করাটা সেই সময়ের উত্তেজনারই শরিক হওয়া একভাবে। যে বিশ্লেষণ, যে বক্তব্য ছবিতে রাখা হচ্ছে তার অংশভুক হতে পেরেও খুব ভালোলেগেছিলো। আর একটা বহু-আস্তরিত ছবিকে চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখেও।

দেখো, খুব কম ছবি আছে কিন্তু যেখানে আমি কেবলমাত্র এক পেশাদার অভিনেতার ভূমিকা অবলম্বন করেছি – অর্থাৎ সেটে এসো, কাজ করো, বাড়ি ফিরে যাও। আমি পরিচালকের কাজ লক্ষ্য করতাম, সে তিনি অভিজ্ঞ হোক কি তরুণ, তার কাজের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা – এগুলোও আমার কাছে প্রচন্ড আকর্ষণীয়।

এবং এ প্রসঙ্গে অপর্ণার (সেন) কথা তো আসবেই, আমরা যেসব কাজ করেছি, এবং করছি, এবং বেশ কিছু পরিচালকের প্রথম ছবি – যেমন, অশোক বিশ্বনাথন, মলয় ভট্টাচার্য, এমন আরো অনেকে। প্রথম ছবির চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে একটা অপূর্ব তাজা উদ্দীপনা থাকে। সবসময় তার পরিণতি যে সুখের হয়না, *আমি-সব-জানি* মানসিকতা থেকে, সেইটা বুঝি, তবু…

আর্যনীলঃ

… অভিনেতা হিসেবে সত্যজিতের methodism–এর থেকে গিয়ার বদলে মৃণাল সেনের মুক্তনির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে আপনার অসুবিধে হয়নি? তখন তো আপনি অতিতরুণ… তাছাড়া একটু আগে যেটা বললাম ওইসব চরিত্রগুলো এতটাই সমসাময়িক যেন এইমাত্র রাস্তা থেকে বা খবরের কাগজ থেকে এইমাত্র উঠে এলো…

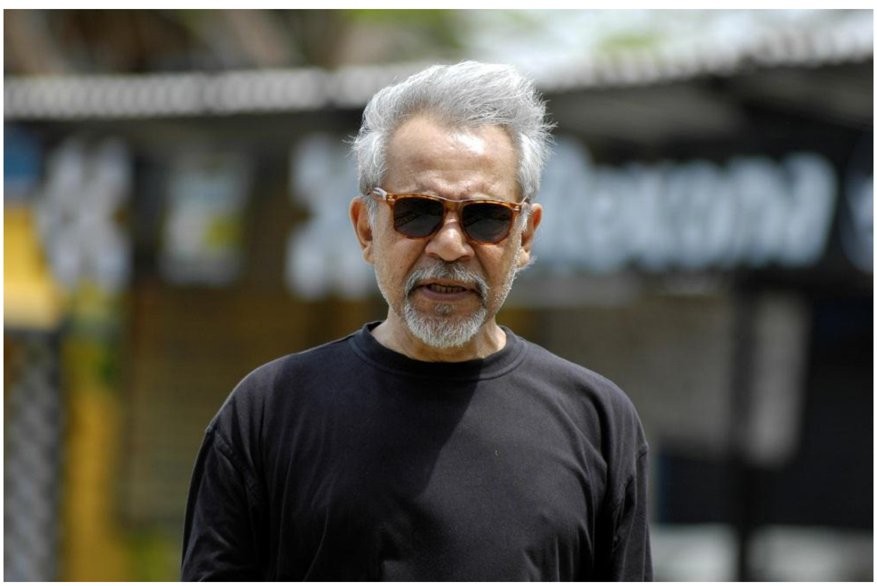

আলোকচিত্রঃ ভি এস রাঘবণ

ধৃতিমানঃ

সত্যজিৎ রায় খুব সুসংহত, methodical এক পরিচালক। মৃণাল সেন অনেক বেশি প্রত্যুৎপন্নমতির, improvisational। কিন্তু অভিনেতাদের পরিচালনা করার ব্যাপারে কিন্তু মানিকদার সেরকম কোনো 'methodism' ছিলো না। অভিনেতা যদি নিজের ডায়ালগ সামান্য বদলে নিতেন নিজের সুবিধের জন্য, মানিকদা কিছুই মনে করতেন না। আর মৃণালদা এই ব্যাপারে আরো এক কাঠি ওপরে। 'আকালের সন্ধানে'তে স্মিতা (পাতিল)-র সাথে অন্তত দুটো শট আছে আমার যেখানে ক্যামেরা রোল করতে শুরু করার পর আমার ভূমিকা আমি নিজের মতো করে নিয়েছিলাম। পুনরাবৃত্তি বাঁচিয়ে বলি, চারপাশ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব ধারণা, বাংলার মন্বন্তর, সমসাময়িক রাজনীতির সাথে তাকে মিলিয়ে পড়া, আপনার নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা – এসবই কিন্তু একজন অভিনেতাকে উন্নত করে, স্রেফ চোখ-কান খোলা রাখলেই হলো।

আর্যনীলঃ

এবার 'আকালের সন্ধানে'র প্রসঙ্গে আসি। এ বিষয়ে আপনার সাথে সিনসিন্যাটিতে ২০১১ সালের হেমন্তে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ছবিটাকে Film-within-a-film বা *Mise en abyme,* যাই বলা হোক না কেন, বাস্তবতা বা চেতনার ওই অতগুলো আস্তর, একাধিক ভাবনা-ত্রয়ী বা thematic triumvirate, ইত্যাদি রীতিমতো ব্যতিক্রমী করে তোলে। তাছাড়া, বহু মানুষের মনে হয়েছে ওটাই পর্দায় আপনার সেরা কাজ। তাই ছবিটা নিয়ে আমি কোনো বিশেষ প্রশ্ন করতে চাই না, আপনার যা ইচ্ছে হয় বলুন...

ধৃতিমানঃ

আমি সারাজীবনে মাত্র দুবার কারো কাছে 'রোল' চেয়েছি। 'আকালের সন্ধানে' তার মধ্যে একটা। মৃণালদার ক্ষেত্রে যেটা সবসময় হয়, গোটা ছবিটার বিবর্তন - সে অমলেন্দুবাবুর অসম্পূর্ণ, অপ্রকাশিত কাহিনীই হোক, কি স্ক্রিপ্ট, কাস্টিং – সবটাই এক মুক্ত প্রক্রিয়া, সংসৃষ্টির প্রক্রিয়া। এক সময় ওই পরিচালকের ভূমিকায় অন্য কাউকে নেবার কথা হচ্ছিলো। আর যেটা আমি তোমায় অনেকবার বলেছি, আমি অভিনয় করা নিয়ে কখনো উত্তেজনায় ভুগিনা। ফিল্মমেকিং আমি বুঝি, নিজে অনেক তথ্যচিত্র করেছি, বিজ্ঞাপনচিত্র করেছি, ইত্যাদি। ১৯৭০ সাল থেকে মৃণালদাকে চিনি। I trusted him implicitly। আর আমি জানতাম যে কাজ করার সময় আমি অনেক অনেক স্বাধীনতা পাবো। কাজেই ওই যে বলে 'go with the flow'...

আমার কাছে কীরকম জানো? আসল যে চাপটা, যে টেনশনটা প্রয়োজনীয়, সেটা শটের সময়কার, যখন বাকী আর সমস্ত কিছু মুছে যায়। অভিনেতা তার নিজের মুক্তাঞ্চলে এসে দাঁড়ায়, তার মন, মনন – সব টানটান হয়ে যায়, অ্যাড্রিনালিনে সঞ্চার আসে। আর কেউ সেখানে নেই, সে ছাড়া। শটের পরে যদি তোমার নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত না মনে হয়, তার মানে কিছু হয়নি।

আর্যনীলঃ

সত্যজিতের অন্তিম ছবি 'আগন্তুক' এর সময় উনি ফরাসী নৃতত্ববিদ, দার্শনিক লেভি ক্লাউদ-স্ট্রাউসের বিভিন্ন রচনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। একথা আমরা প্রথম, অথবা বলা যায় একমাত্র আপনার থেকেই জানি। এ ব্যাপারে যদি কিছু আলোকপাত করেন...

ধৃতিমানঃ

Well .....উনি তখন খুব অসুস্থ...যে সময় 'আগন্তুক' লেখা হচ্ছে। আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন আমার অংশটুকু পড়ে শোনাতে, কিন্তু এতটাই উদ্দীপ্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন মানিকদা, গোটা স্ক্রিপ্টটাই পাঠ করলেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। বিজয়াদি বারবার বারণ করছেন, তাও। সেদিনই আমায় বললেন যে নৃতত্ত্ববিদ লেভি-স্ট্রাউসের লেখা পড়ছেন, এমনিতেও ওঁর বাড়িতে যখন যেতাম এই কথাই হতো, সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন, নৃতত্ব – এইসব নিয়ে। অতোটা সিনেমা নিয়ে নয়। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আদিম মানব সম্বন্ধে ওনার মনে একটা আগ্রহ জন্মাচ্ছে, সভ্যতা কী? – এমন কিছু প্রশ্ন আসছে – যেগুলো উনি আগন্তুকের মূল চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসায় প্রতিফলিত করেছেন। এমনকি সেদিন আমাকে বললেন, 'আমি উৎপলকে বলেছি, তুমি আমার ভূমিকায় নামছো'। এর বেশি কিছু না, I know it's an interesting recollection, but I don't really like making private anecdotes public ... এতে কী হয় জানো? একজন বিখ্যাত ব্যাক্তির সাথে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিলো – এইরকম শোনায় আর কি...

আর্যনীলঃ

না, না তা কেন হবে? 'আগন্তুক'-এ ওনার কনসার্নটা একেবারেই নতুন মৌল... বেশ অচেনা এক সত্যজিৎ। এর নেপথ্যে কী কী কাজ করছিলো সে ব্যাপারে কেউই তেমন আলোকপাত করেননি, তাই জিজ্ঞেস করলাম...

সিনিসিন্যাটির ইডেন পার্কে আর্যনীল ও ধৃতিমান
আলোকচিত্রঃ ঋক মুখোপাধ্যায়

উত্তরলিপিঃ *এইখানে এই কথকতায় ভাঁটা পড়েছিলো বা বাকস্রোত পাতাল প্রবেশ করেছিলো এমন কিছুই বলা যায় না। যেভাবে দিনের কাজ একসময় স্বাভাবিকভাবে শেষ হয়, অসম্পূর্ণ থেকে, মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, পরের দিন আবার ফেলে রাখা কাজ শুরু হয়, সেইভাবেই 'অ-বলা'র চলা শুরু হবে আবার, আরেকদিন -এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ওপরের গোটা কথোপকথনটা গড়ে উঠেছে প্রায় চার বছর ধরে, কখনো সামনাসামনি সিরিয়াস আলোচনায়, কখনো আলগা আড্ডার আলগোছা বুননে, কখনো দূরভাষে, আর অতি-সম্প্রতি ইমেলের বৈদ্যুতিন বাঁধনে। সবকিছুর মতো আলাপেরও একটা জীবন থাকে। তাকে নিজের গতি প্রকৃতি নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। মনে পড়ে গেলো চার্লি চ্যাপলিনের আত্মজীবনীর একটা উক্তি, যা মৃণাল সেনের খুব প্রিয় – Life goes on and that is progress।*

===